এই সময় সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে এই সকল গুপ্তবিদ্যা, ভূতুড়ে কাণ্ড সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলিতে আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

সংরক্ষণ

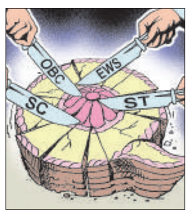

সরকারি ভাবে তফসিলি উপজাতির তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। ভোটমুখী হিমাচল প্রদেশে হাত্তি সম্প্রদায় তালিকাভুক্ত হল, ঝাড়খণ্ড সরকার ওবিসি সংরক্ষণকে ২৭% পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল, অতএব পশ্চাৎপদতার সুদীর্ঘ তালিকাটি কলেবরে আরও কিছু বৃদ্ধি পেল। এই সংযোজন সব সময় মসৃণ নয়, প্রক্রিয়া থমকে থাকে। প্রসঙ্গত, হিমাচলে হাত্তিদের দাবি নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় দলিতেরা। মিনা-রা এই সংরক্ষণ থেকে সুবিধা পাচ্ছে ভেবে সেই মর্যাদার জন্য আন্দোলন শুরু করে রাজস্থানের গুজ্জর-রাও, এখন তারা এমবিসি (মোস্ট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস)-র ৫%-এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য দিকে, স্থানীয় নির্বাচনে মহারাষ্ট্রের চালু করা ওবিসি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টে অনুমোদিত হতে হয়েছে— সংরক্ষণের জন্য আদালত-নির্দিষ্ট 'ট্রিপল টেস্ট'-এ (কমিশন প্রতিষ্ঠা, সম্প্রদায়ের সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ ও স্থানীয় প্রশাসনে তাদের সংরক্ষণ দেওয়া) তারা উত্তীর্ণ। দক্ষিণ ভারতে সন্দেহজনক খেলাটিতে শীর্ষস্থানে তামিল নাড়ু।

একদা নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে যার জন্ম, তার ছায়া এখন নিয়ম অপেক্ষাও দীর্ঘ। যেমন, বর্তমানে সাংবিধানিক বেঞ্চে বিচারাধীন 'অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ' (ইডব্লিউএস) বর্গটি কেন্দ্রের ৫০% সংরক্ষণের গণ্ডি লঙ্ঘন করছে। ঝাড়খণ্ডে সরকারি চাকরির ৭৭% সংরক্ষিত বলে হইচই পাকানোর কিছু নেই, একাধিক রাজ্য ১০০%-এর অভিমুখে ধাবমান। মেধার জন্য, অতএব, কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। সংরক্ষণকে অনেকেই উচ্চশিক্ষা, চাকরি ও সরকারি প্রকল্পের পৌঁছনোর সড়ক মনে করেন। তা অসত্যও নয়— সরকারি চাকরিতে আসন সীমিত, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও, এবং সরকারি প্রকল্পে অর্থ-সংকটের কথা কে না জানে! তদুপরি, চাহিদার তুলনায় জোগান হ্রস্বমান। আরও বেশি সম্প্রদায়ের মানুষ সংঘাতে জড়াচ্ছে, সুযোগবৃত্তও ছোট হচ্ছে। প্রশ্ন হল, গত তিন দশকে ভারতের সমাজ-অর্থনীতিতে কোন বদলটি সবচেয়ে বড় সত্য? সংস্কারের ফলে লক্ষ-লক্ষ মানুষের দারিদ্রমুক্তি। বস্তুত, চূড়ান্ত দারিদ্র এখন এ দেশে ইতিহাস, জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভান্ডারের সাম্প্রতিক সমীক্ষা। ক্ষেত্রবিশেষে প্রভূত বঞ্চনা রয়েছে, শ্রম বাজারের নিচুতলায় চাকরির স্থায়ী সমস্যাও ঘোর বাস্তব, উচ্চশিক্ষাতেও যথেষ্ট আসন নেই, কিন্তু এই সমস্যার কোনওটির সুরাহাই সংরক্ষণে নয়। তার জন্য আন্দোলন করা সামাজিক গোষ্ঠীগুলির এই গোড়ার কথাটি অনুধাবন করা বাঞ্ছনীয়।

বিদ্বেষ

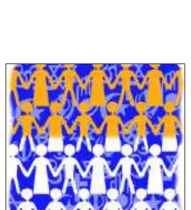

উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বিতে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে জাতীয় সঙ্গীত থেকে 'উৎকল' ও 'বঙ্গ' শব্দদ্বয় বাদ গেল। রাজনৈতিক চাপান-উতোরের মাঝে 'ভুল করে ছাপা হয়ে গেছে' ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে তুলে নেওয়া হচ্ছে প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ বই, যা বস্তুত নাগরিকদের করের টাকায় ছাপানো। সংশোধনের পর যে নতুন বই বেরোবে, তার জন্যও সমপরিমাণ করের টাকাই খরচ হবে। কার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তির ফলে এই বিপুল ক্ষতির দায় সরকারকে বহন করতে হচ্ছে, এ সব ক্ষেত্রে সে খবর নাগরিকের পাওয়ার উপায় নেই; থাকলেও এত শ্রমসাধ্য যে, বেশির ভাগ মানুষ সে পথ পরিহার করে চলাই শ্রেয় বোধ করেন। তবে, ওই শব্দ দু'টি বাদ দেওয়ার পিছনে যদি অসাধু রাজনৈতিক চক্রান্ত থেকেও থাকে, তা হলেও সেটি সাধারণ নাগরিকদের অজানতেই। প্রশ্ন হল, এ ভাবে নাগরিককে বড় মাপের চক্রান্তের অংশীদার বানানো হচ্ছে না তো? কেননা, একটি পর্যায়ের পর নাগরিকদের অজ্ঞানতার দোহাই দিয়ে যে লাভ নেই, ইতিহাসেই তার প্রমাণ। জাতি-বিদ্বেষের বীজ সমাজে এমন সূক্ষ্ম ভাবেই বপন করে রাজনীতির কারবারিরা, গত কয়েক বছরে ভারতেও সে কাজ চলছে। এর বিপ্রতীপে তাই 'ছাপার ভুল' খুঁজে বার করা, এবং 'উৎকল' ও 'বঙ্গ'কে নিজেদের দেশ বলে চেনার দায়িত্বটি নাগরিকের। না হলে রাজনীতির ফাঁদেই পা দেওয়া হবে।

অসংখ্যা

৮৪৯৫২০
০০০০০০

(আট লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো কুড়ি কোটি) টাকা— বিগত বাজেটে উত্তর প্রদেশ শিক্ষাবরাদ্দের পরিমাণ। সূত্র: দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া

দিনকেদিন

১৯ সেপ্টেম্বর

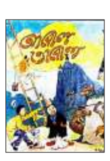

১৯২৩: সুকুমার রায়ের লেখা 'আবোল তাবোল' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ইউ রায় অ্যান্ড সনস্। বইটিতে মোট তিপ্পান্নটি ছড়া ছিল, তার মধ্যে সাতটি নামবিহীন।

১৯২৪: সুচিত্রা মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই কিংবদন্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ১৯৭৪ সালে পদ্মশ্রী-তে ভূষিত হন। ১৯৮৬-তে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান।

অন্তর্মুখী

স্বামী পবিত্রানন্দ

বোধিবৃক্ষ

বহির্মুখীন জ্ঞান অনর্গল প্রবাহরূপে যেন স্বরূপচ্যুত হইয়া বাসনা-কামনারূপ অবিরাম একের পর এক বৃত্তিসম্পন্ন হইয়া অনাদিকাল হইতে চলা শুরু করিয়া যাত্রাপথ শেষ করিতে পারিতেছে না। এই যাত্রার শেষ কোথায় সে নিজেও বোঝে না। এই গতির বিড়ম্বনা হইতে পরিত্রাণ পাইতে যখনই সেই ব্যবহারিক জ্ঞান-সম্পন্ন ভিতরের মানুষটির (বিবেকের) শুভেচ্ছা হয়, তখনই ধর্ম বা আধ্যাত্মিক জগতের প্রবেশের অধিকার তাহার আপনা হইতেই আসে। ইহাই বহির্মুখীনতা হইতে অন্তর্মুখীন হওয়া। প্রকৃত সত্য যাহা, তাহা অনাত্মজগতে, কখনই পাওয়া সম্ভব নহে, পাইতে হইলে আমার অন্তর্জগতেই পাওয়া সম্ভব। তখনই গুরু ও বেদান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া সদগুরুমুখে আত্মতত্ত্ব শ্রবণে ব্রতী হয়। শ্রবণের পর আত্মাভিমুখী মননের সাহায্য লইয়া আত্মমার সমীপবর্তী হওয়ার যোগ্যতাও লাভ করে। তাহার পরই দ্রুত আসে নিদিধ্যাসনাবস্থা। তখন নিদিধ্যাসন-রত ব্যবহারিক জ্ঞানই তাহার নামরূপাত্মক জামা পোষাক ছাড়িয়া অসঙ্গ হইতে চায়। ঢেউ যেন তাহার গতি ছাড়িয়া নিস্তরঙ্গ বা শান্ত হইতে চায়। এইখানেই যমে-মানুষে টানাটানি। একদিকে অমৃতত্ব অর্থাৎ আত্মার সেই নিঃসঙ্গ অথচ ব্যাকুল ডাক যাহা কালাতীত দেশাতীত কার্যকারণ ভাবাতীত যাহা মানুষের স্বরূপ এবং যাহা প্রকৃত মায়ার নাশক অর্থে যম বা গুরু এবং অন্য দিকে সেই পূর্বানুবৃত্ত ক্ষীণ অহংকারের রেশ— এই দুইয়ের যুদ্ধই তো সুরাসুর সংগ্রাম। ('এক ও একতা' থেকে গৃহীত)

পারস্পরিক দোষারোপের আগে এনসিআরবি রিপোর্ট-এর খামতিগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার

রাজনীতির তর্কে আড়াল হয়ে যাচ্ছে তথ্যের যুক্তি

কোনও শহরে অপরাধের সংখ্যাধিক্য দেখে কোনও সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে ভুল হতে পারে। যথাযথ ব্যাখ্যার জন্য আরও গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। লিখছেন **শাশ্বতী ঘোষ**

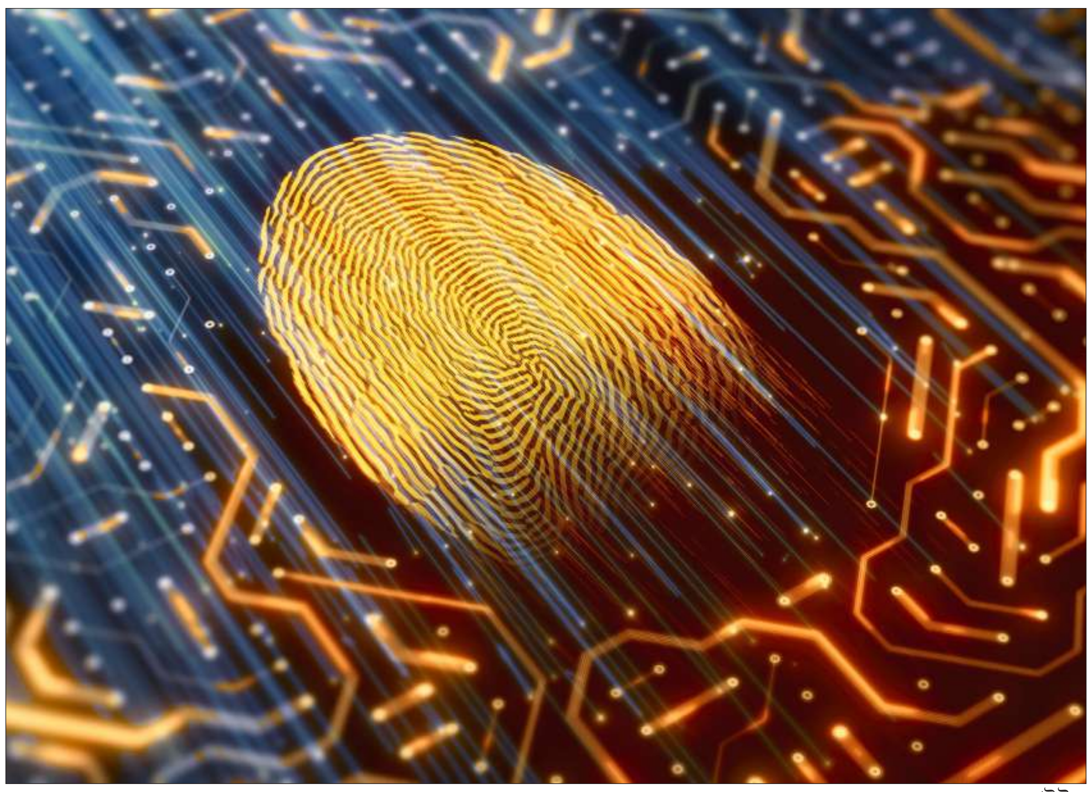

আইস্টক

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র ২০২১ সালের রিপোর্ট 'ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া' অগস্ট মাসের শেষে প্রকাশ হতেই দেখা গেল সারা দেশের মেট্রো শহরগুলোর মধ্যে কলকাতা শহর মেয়েদের নিরাপত্তায় আবার সবার উপরে ঠাঁই পেয়েছে। আর রাজধানী দিল্লিকে ধর্ষণের সংখ্যার নিরিখে আবারও মনে হচ্ছে মেয়েদের জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক। এই নিয়ে প্রত্যাশিত ভাবেই বিজেপি-শাসিত বনাম অ-বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে চেনা চাপানউতোর শুরু হয়ে গেছে। আর এই রাজনৈতিক বিবাদের মধ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছে এই তথ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবনা বা তথ্যের কিছু সমস্যা, যেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা এই তথ্যকে দেখবার একটা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত দিতে পারে।

৩৬টি রাজ্য আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ২০১১ সালের জনগণনা ধরে দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা, এ রকম ৫৩টি মেট্রো শহর থেকে এনসিআরবি রাজ্য স্তরের ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। সেখানে যদি পুলিশ একাধিক ধারায় কোনও অপরাধকে নথিভুক্ত করে, তার মধ্যে যে অপরাধে শাস্তির মাত্রা সর্বোচ্চ, শুধু সেটিই গণ্য হবে। যদি ধর্ষণ ও হত্যার জন্য কেউ অভিযুক্ত হয়, এনসিআরবি-র নথিতে শুধু হত্যা বলে নথিভুক্ত হবে, যেমন যদি কেউ পণের জন্যে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়, তাঁর জন্যও পণের দাবি নথিভুক্ত হবে না। ফলে ধর্ষণ বা পণের অপরাধের নথিভুক্তি কিন্তু কমে যাবে। বাস্তবে হচ্ছেও হয়তো তাই।

অপরাধ বনাম নথিভুক্তি

বড়ো শহর হলে অপরাধ বেশি হবে ধরে নিয়ে ছোট আর বড়ো জায়গার মধ্যে তুলনার জন্যে অপরাধের সংখ্যা না নিয়ে অপরাধের 'হার'কে হিসেবে ধরা হয়। অপরাধের হার হল প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় কতগুলি অপরাধ ঘটছে। এই জনসংখ্যার তথ্যটি আসছে ২০১১ সালের জনগণনা থেকে। সেটা যথেষ্ট পুরনো তথ্য, বিশেষত ২০২২ সালে যদি তা হিসেবের ভিত্তি হয়। সেই সঙ্গে এটা মাথায় রাখা দরকার যে অপরাধের নথিভুক্তির সংখ্যা বেশি হলে সেটা সব সময় খুব খারাপ না-ও হতে পারে। যদি রাজ্যের পুলিশ নাগরিকদের মধ্যে বিচার পাওয়ার আশা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, নাগরিকেরা হয়তো এগিয়ে এসেই অপরাধ ঘটলে নথিভুক্ত করার উদ্যোগ নেবেন। যেমন অনলাইনে নথিভুক্তি বা ই-এফআইআর, বা মেয়েদের জন্যে বিশেষ হেল্পডেস্কের ব্যবস্থা করলে হয়তো অনেক বেশি অপরাধ নথিভুক্ত হবে। আবার অপরাধের সংখ্যা কম মানেই নাগরিকেরা বেশি নিরাপদ, তা নাও হতে পারে। তাই কোনও স্থানকে 'ধর্ষণের রাজধানী' বা 'অপরাধের রাজধানী' অভিধা দেওয়ার আগে একটু ভাবা দরকার। যেহেতু স্থানীয় স্তর থেকেই রিপোর্টের মূল তথ্যগুলি আসবে, তাই যদি স্থানীয় স্তরে যদি পুলিশকর্মীর সংখ্যা কম থাকে, তা হলেও নথিভুক্তি বা তথ্য সঙ্কলন ব্যহত হতে পারে। আবার নির্ভয়া কাণ্ডের পর দিল্লিতে নথিভুক্তির সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল বলে আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা বেড়েছে বলে মনে হয়েছিল। সেই ২০০৫ সালে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমল থেকেই ঘটনা না নথিভুক্তি, কোনটা বেড়েছে, সে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। আজ শুধু শাসক আর বিরোধীর অবস্থান উল্টে গিয়েছে।

তথ্যের ফারাক

শুধুমাত্র নথিভুক্ত ঘটনাই এই রিপোর্টের আওতায়, তাই অনেক তথ্যের ক্ষেত্রে কোন সূত্র থেকে তথ্য আসছে, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। যেমন সাম্প্রদায়িক ঘটনার তথ্যে ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ সালের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে স্বরাষ্ট্র দপ্তর আর এনসিআরবির তথ্যে বিস্তর ফারাক। অথচ এনসিআরবি স্বরাষ্ট্র দপ্তরেরই অংশ। তার অর্থ, সাম্প্রদায়িক অশান্তির তথ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে 'ঘটনা' হিসাবে খবর গিয়েছে, কিন্তু সে রকম অনেক ঘটনায় পুলিশ এফআইআর দায়ের করেনি। যেমন ২০১৪ সালে ২৩টি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্বরাষ্ট্র দপ্তর আর এনসিআরবি-র তথ্যে বিস্তর ফারাক ছিল। হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, তামিলনাড়ু আর পশ্চিমবঙ্গে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তুলনায় এনসিআরবি-র তথ্যে ঘটনার সংখ্যা অনেক বেশি, আবার কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান আর উত্তরপ্রদেশে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নথিভুক্ত ঘটনার সংখ্যা অনেক বেশি। একই ভাবে ২০১৫ সালে ২৪টি আর ২০১৬ সালে ২৫টি রাজ্য আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে তথ্যের বিস্তর ফারাক দেখা গেছে। পরবর্তী বছরগুলি নিয়ে তুলনা করলে হয়তো দেখা যাবে এই ধারা অব্যাহতই আছে।

দীর্ঘসূত্রিতার সমস্যা

সাধারণ ভাবে 'ক্রাইমস ইন ইন্ডিয়া' রিপোর্টে জেলাস্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, তার পর তুলনা করে, ভেরিফিকেশন করে মোটামুটি এগারো মাস বাদে রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা। এই মূল রিপোর্টে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ, পুলিশের নথিভুক্ত ঘটনাগুলির কী হল, কতগুলি চার্জশিট হল, কতগুলি ডিসমিস হল, কতগুলি পরের বছরের জন্যে তোলা রইল, একই ভাবে আদালতেও কতগুলি মামলায় শাস্তি হল, কতগুলি খারিজ হল, কতগুলি সেই বছরে সমাধান হল, কতগুলি জমে আছে, নারী, শিশু বা প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ থাকে। ১৯৫৩ সাল থেকে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। ২০০০ সালের আগে গড়ে ২৩ মাস দেরি হত রিপোর্ট প্রকাশে, ২০০০ সাল থেকে এগারো মাসে রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রেকর্ড সময় দেরি হয় এই রিপোর্ট প্রকাশে, ৮৬ মাস, ১৯৮৫ সালের রিপোর্ট ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। আর ১৯৮৩ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় পাঁচ বছর পরে। এ ছাড়া তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি, জেলা, রাজ্য, জাতীয় স্তরে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যোগাযোগের নিয়মিত ব্যবস্থা, সব কিছু রিপোর্ট প্রকাশের সময়কে কমিয়ে দশ মাসের মধ্যেও এনে ফেলেছে, যদিও মাঝে মাঝে এখনও দেরি হচ্ছে। দেরির কারণ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক নাকি প্রযুক্তিগত, তা নিয়েও বিতর্ক আছে।

> কোন সূত্র থেকে তথ্য আসছে, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। সাম্প্রদায়িক ঘটনার তথ্যের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর আর এনসিআরবি-র তথ্যে বিস্তর ফারাক। অথচ, এনসিআরবি স্বরাষ্ট্র দপ্তরেরই অংশ।

দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা ও কারাবন্দি

ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া ছাড়াও আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট এনসিআরবি সঙ্কলন ও প্রকাশ করে। প্রথম, 'অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথস অ্যান্ড সুইসাইডস ইন ইন্ডিয়া', ১৯৭৬ সাল থেকে, প্রথম দিকে ২১ মাস বাদে বাদে প্রকাশ হত, ২০০৫ সালের পর থেকে ৯ মাসের তফাতে, পরে আরও দ্রুত প্রকাশিত হয়েছে। আবার ১৯৭৯ আর ১৯৮৫ সালে ৪০ মাসের পর প্রকাশিত হয়, ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয় ২৭ মাস পরে। বিরোধীদের প্রশ্ন, এই দীর্ঘসূত্রিতা কি এই রিপোর্ট নিয়ে যেন সরকারকে অস্বস্তিতে পড়তে না হয়, সে জন্যে? বিশেষত কৃষকদের আত্মহত্যার মতো বিষয় নিয়ে? বা পথসুরক্ষায় সরকার যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ করে না বলে পথ দুর্ঘটনা বাড়ছে, এ রকম অভিযোগ থেকে বাঁচতে? এ বছরে যেমন দিনমজুর শ্রমিকদের আত্মহত্যা তালিকার উপরের দিকে থাকায় সেই সব মানুষদের প্রতিশ্রুত 'সুরক্ষা বলয়'-এর আওতায় আনার ব্যর্থতাই এই তথ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, এ রকম অভিযোগ উঠে আসছে।

আর একটি যে রিপোর্ট এনসিআরবি ১৯৯৫ সাল থেকে প্রকাশ করে সেটি হল 'প্রিজন স্ট্যাটিস্টিক্স ইন ইন্ডিয়া'। এটিও প্রথমে দু'বছর অন্তর প্রকাশিত হলেও ২০০৫ সাল থেকে সময়-ব্যবধান ক্রমশ কমে এক বছরের নীচে চলে এসেছে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে কোনও কোনও বছরে, যেমন ২০১৬ সালে এই দু'টি রিপোর্টই দু'বছরের বেশি সময় নিয়েছে। কেন? সরকারের বক্তব্য, তথ্যসারণি নতুন করে সাজানোর জন্যে সময় লেগেছে। এটা অবশ্য সত্যি যে কী নেওয়া হবে, কী ভাবে নেওয়া হবে, সেই ভিত্তি বদল হয়েছে, সে জন্যে অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তুলনা করাও মুশকিল হয়ে যায়। কিন্তু সেটাই কি উত্তর?

সদিচ্ছার অভাব

একটি বিশ্লেষণ দেখিয়েছিল যে ২০১৯ সালে জুলাই মাসে সরকারকে অন্তত ২৭টি প্রশ্ন লোকসভায় করা হয়েছিল এই রিপোর্টের ভিত্তিতে। এর মধ্যে ২৪টি প্রশ্ন নির্দিষ্ট ভাবে তার আগের তিন (কোনওটিতে চার) বছরের তথ্যের তুলনার ভিত্তিতে। সরকার মাত্র দু'টি প্রশ্নের (ক্রমিক ৫৬৭ ও ১৬০৬) জবাব দেয়, এনসিআরবি-র তথ্য ব্যবহার করে জানায় কত জালনোট ধরা পড়েছে। কিন্তু ১৬২৩ নম্বর প্রশ্নে কৃষক আত্মহত্যা গত তিন বছরে বেড়েছে কিনা সে প্রশ্নের জবাবে বলে যে সে রকম কোনও তথ্য নেই। ২০১৫ সালের রিপোর্টে কৃষক আত্মহত্যার কারণ হিসাবে ঋণগ্রস্ততা (৪০%) আর কৃষি সম্পর্কিত বিষয় (২০%) মূল দু'টি কারণ হিসাবে উঠে আসে। ২০১৬-'১৭ সালের নাবার্ড-এর সমীক্ষা দেখায় কৃষক পরিবারে গড় ঋণগ্রস্ততা ১.০৫ লক্ষ টাকা। ২০১৯-'২০ সালের বাজেটে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারগুলিকে ৬০০০ টাকা করে সহায়তা দেওয়ার প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে, এবং তা কার্যকরও হয়েছে। সেই সহায়তা গড় ঋণগ্রস্ততার তুলনায় এতই ক্ষুদ্র যে প্রশ্ন উঠবেই। তাই প্রশ্ন ওঠে জালনোট নিয়ে সরকারের এজেন্সি তথ্য সংগ্রহ করলে তা নিয়ে সরকার মন্তব্য করছে, কিন্তু কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

তাই কোনও শহরকে 'ধর্ষণের রাজধানী' বলে রাজনীতি শুরু করার আগে তথ্যগুলি নিয়ে একটু গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। সব শেষে, এই রিপোর্টগুলি থেকে আদালতে বছরের পর বছর মামলা জমে যাওয়ার যে ছবি উঠে আসছে, তা নিয়ে যদি কল্যাণকামী রাষ্ট্র মাথা না ঘামায়, তা হলে নাগরিকের কোনও সংবিধানসম্মত অধিকার আর কার্যকর থাকেনা।

লেখক সমাজকর্মী ও অর্থনীতির শিক্ষক

প্রতি সম্পাদক

চাওয়া পাওয়া

ট্রেনে জবরদস্তি সিট দখল

▶ ৭.৩০-এর রানাঘাট-শিয়ালদহ গ্যালোপিন মেমু স্পেশাল ট্রেনে (০৩১৪০) প্রতিদিন যাত্রীদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। রানাঘাট থেকে ট্রেন ছাড়লে কিছু যাত্রী প্রতি দিন কাগজ, রুমাল, ইটের টুকরো পেতে ট্রেনের সিটগুলো সব দখল করে রাখেন। তার পর অশ্লীল গালাগাল দিতে দিতে তাস খেলা তো আছেই। ওই সমস্ত নিত্য যাত্রীদের এ নিয়ে কিছু বলতে গেলেই তাঁরা দল বেঁধে মারমুখী হয়ে ওঠেন ও গালবর্ষণ করেন। দিনের পর দিনে এভাবে চলা অরাজকতা বন্ধ হোক। বিষয়টি নিয়ে রেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইয়ামিন হোসেন, নওদা, মুর্শিদাবাদ

ক্লাসঘরে চাঙড় খসে পড়ছে

▶ হাওড়া জগৎবল্লভপুর আরএন বসু উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে বিভিন্ন ঘরে চাঙড় খসে পড়ছে আর ছাদের বেশিরভাগ জায়গায় ফাটল ধরেছে। চাঙড় ভেঙে পড়ার জন্য ২ টি ক্লাসঘর বন্ধ আছে। বাকি ১৬টি ক্লাসঘরে কোনও রকমে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস চলছে। পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারও চাঙড় খসে পড়ার কারণে তালা বন্ধ। দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস চলাকালীন একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়। যে ঘরগুলোতে এখন ক্লাস হচ্ছে সেগুলোতেও ক্লাস চলাকালীন পড়ুয়ারা ভয়ে ভয়ে থাকে। অবিলম্বে স্কুলের সংস্কার হোক।

অপূর্বলাল নস্কর, ভান্ডারদহ, হাওড়া

শ্রীরামপুরে সেতু জরুরি

▶ শ্রীরামপুরে যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে এখানে গঙ্গার উপর একটি সেতু নির্মাণ করার কথা বহু দিনের। কিন্তু নানা কারণে কোনও ভাবেই বালি ব্রিজ ও ঈশ্বরগুপ্ত সেতুর ৩২ কিলোমিটার দূরত্বের মাঝে তৃতীয় সেতু তৈরি হল না। তার উপর এখানে গঙ্গা পারাপারের জন্য চার চাকার ভেসেলও চালু হয়নি। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তাপস সাহা, শেওড়াফুলি, হুগলি

বেহাল স্টেশনের প্রবেশপথ

▶ হাওড়ার আমতা স্টেশনের প্রবেশপথটি জল-কাদা ও আবর্জনায় ভরা। চারশো ফুটের মতো এই রাস্তা বতর্মানে পিচ উঠে বেহাল অবস্থা। গোটা রাস্তাটি ভরে গিয়েছে ছোট-বড় খানাখন্দে। বিভিন্ন যানবাহন থেকে পথচারী, সবাই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। অবিলম্বে রাস্তাটি মেরামত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দীপংকর মান্না, চাকপোতা, হাওড়া

কাঁটাপুকুর ডাকঘরের সার্বিক উন্নয়ন হোক

হাওড়ায় বাগনান উপ-ডাকঘরের অধীন প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা ডাকঘর কাঁটাপুকুর (৭১১৩০৩)। বর্তমানে এই ডাকঘরে গ্রাহক ও আমানতকারীর সংখ্যা প্রায় আটশো। ডাকঘরের পরিষেবা এবং পরিকাঠামো অত্যন্ত অনুন্নত। টালি ও খড়ের ছাউনিযুক্ত এক চিলতে গুমটিঘরে কোনওক্রমে চলছে যাবতীয় কাজ। অফিসের ভিতরের পরিসর প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছোট এবং সেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। শ্যামলা ধরা জরাজীর্ণ দেওয়াল থেকে প্রতিনিয়ত খসে পড়ছে পলেস্তারা। উন্নত প্রযুক্তি তো দূর, এখানে অধিকাংশ সময়ে মেলে না সামান্য ডাকটিকিট বা রেভিনিউ স্ট্যাম্পও।

তন্ময় মান্না, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

কালীঘাট থেকে ট্রাম চলুক

▶ লকডাউনের পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরেও কালীঘাট ডিপো থেকে ট্রাম চলে না। এখান থেকে বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জ পর্যন্ত ট্রাম সহজেই চালানো যেতে পারে। ট্রাম চালু হলে বহু যাত্রী কম টাকায় যাতায়াত করতে পারবেন।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দপুর, কলকাতা

যত্রতত্র ময়লা নিক্ষেপ বন্ধ হোক

▶ সন্তোষপুরের মডার্ন পার্কে এভিনিউ ইস্ট রাস্তায় পোস্ট নম্বর ১৯৯/১৭/৪ সংলগ্ন স্থানে রাস্তার উপর প্লাস্টিক ও নানা আবর্জনা পড়ে থাকে। কুকুরদের দৌলতে আবর্জনা রাস্তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্গন্ধযুক্ত মাছের আঁশ, কাঁটা, তরকারির খোসা, এমনকি মহিলাদের স্যানিটারি প্যাডও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে। সকালবেলায় পুরকর্মীরা নিয়মমাফিক বাড়ি থেকে আবর্জনা নিয়ে যান, তবুও কিছু অসচেতন মানুষ রাস্তায় এ ভাবে আবর্জনা ফেলছে। লাইট পোস্ট নম্বর ১৩২/৭/৩/২২ সংলগ্ন স্থানেও একই অবস্থা।

অমিতকুমার চৌধুরী, মডার্ন পার্ক, কলকাতা

ডিসান মোড়ে বেহাল রাস্তা

▶ রুবি হাসপাতালের কাছে ডিসান মোড়ে রাস্তা এখন কার্যত বেহাল। পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত। বর্ষার জলকাদায় তা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। যানবাহন এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দুলতে দুলতে যাচ্ছে। যাত্রীবাহী বাস উল্টেও যেতে পারে।

ত্রিদিব মিত্র, নরেন্দ্রপুর

গলসিতে খাল কচুরিপানায় ভর্তি

▶ পূর্ব বর্ধমান গলসি থানার অন্তর্গত কুলগড়িয়া চটি থেকে খানা জংশন পর্যন্ত লিঙ্ক রোডের দু'পাশের নালা দু'টি কচুরিপানায় ভর্তি হয়ে গেছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চাষের জমির জল নিকাশি করে এই নালা দু'টি। স্টেশন রোডের দুই পাশের চারটি রাইস মিলের নোংরা জল নয়ানজুলিতে বদ্ধ হয়ে কচুরিপানার জন্ম দিচ্ছে। তা ছাড়া নালা দু'টি দীর্ঘদিন সংস্কারও হয়নি। রাস্তার পূর্ব দিকের পাকা নালাটিও

ভগ্নদশা। জমি থেকে জল নিকাশি না হয়ে রোয়া ধান ভেসে যাচ্ছে। সাঁকো, বড়মুড়িয়া ও শশঙ্গা গ্রামের অসংখ্য কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

নিয়ামুল হোসেন মল্লিক, গলসি, পূর্ব বর্ধমান

চন্দ্রপুরে বেহাল রাস্তা

▶ হাওড়া আমতা-১ চন্দ্রপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনে ছাখানা থেকে ঘোষপুর পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। খানাখন্দে ভরা গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দিয়ে অটো, টোটো ও অ্যাম্বুলেন্স নিত্য যাতায়াত করে। বর্ষায় রাস্তাটির অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অমল চট্টোপাধ্যায়, আমতা, হাওড়া

চাঁপদানিতে বেহাল খেলার মাঠ

▶ ভদ্রেশ্বরে কেজিআরএস পথ সংলগ্ন চাঁপদানি পুরসভার খেলার মাঠটি বর্তমানে বেহাল অবস্থা। স্থানীয় কিছু ফুটবল ক্লাব এই মাঠে ফুটবল অনুশীলন করতে পারছে না। মহকুমা লিগ চলাকালীন হোমগ্রাউন্ড না দেখাতে পারায় স্থানীয় ফুটবলারদের লিগের সব খেলাই বাইরের মাঠে খেলতে যেতে হচ্ছে। মাঠটিকে শীঘ্র খেলার উপযোগী করে সঠিক ভাবে দেখাশোনা করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হোক। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কালীশঙ্কর মিত্র, ভদ্রেশ্বর, হুগলি

ইছাপুরে মাছ আগাছায় ভর্তি

▶ ইছাপুর নর্থল্যান্ড হাইস্কুল ও ইছাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত মাঠটির অবস্থা খুব খারাপ। স্থানীয় ছেলেমেয়েদের খেলাধুলো পুরোপুরি বন্ধ। পুরো মাঠ ভরে গেছে ঘাস ও আগাছায়। বাসা বেধেছে অনেক বিষধর সাপ। সাপ ও কীটপতঙ্গের জেরে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে ভয় পায়। রাইফেল ফ্যাক্টরির কাছে অনুরোধ, আগাছা পরিষ্কার করে মাঠটিকে খেলার উপযোগী করে তোলা হোক।

বিজন মজুমদার, ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

এলাকার সমস্যার কথা লিখে জানান। ই-মেল বা চিঠিতে। চিঠির উপরে অথবা ই-মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন 'প্রতি সম্পাদক: চাওয়া পাওয়া'। চিঠি পাঠান পাতার নীচে দেওয়া ঠিকানায়। সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি থাকলে পাঠাতে পারেন।

ই-মেল: chaoyapaoya.eisamay@gmail.com